কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড কিন্তু সত্যিই ভালো

শুধু সমাজকল্যাণ করে অর্থনীতির রূপ পাল্টায়?

ভূমিসংস্কারের সাফল্য শিল্পায়নের পথ কঠিন করেছিল। তার ফলে আজ মানুষকে টাকা দেওয়া জনপ্রিয় হয়েছে। এই পথে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভব? লিখছেন **মৈত্রীশ ঘটক** ও **তনিকা চক্রবর্তী**

কেবলই ছবি। ২০০৮ সালে সিঙ্গুরে সামনে কৃষিজমি, পিছনে নির্মীয়মাণ গাড়ি কারখানা *ফ্লিকার*

২০০৮ সালে সিঙ্গুর প্রকল্প বাতিল হওয়ার পরে মোটামুটি যে আখ্যানটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা হলো সস্তা রাজনীতির যূপকাষ্ঠে রাজ্যে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ একটা বড় ধাক্কা খেলো। এই বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে মতামত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করতে পারে, কিন্তু উপর উপর দেখলে এই বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ওই ঘটনার কিছু দিন পরে সমীক্ষার সূত্রে সেই অঞ্চলে কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথন থেকে উঠে আসা একটা তথ্য আপাত দৃষ্টিতে খানিকটা অদ্ভুত লাগে। তা হলো, দরিদ্রতর কৃষকেরা জমি বেচতে বেশি অনিচ্ছুক। যে পরিবারগুলির কৃষি-বহির্ভূত কাজকর্মের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই, তাদের কাছে জমি শুধু একটা অর্থকরী সম্পদ নয়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি এবং বিপদে আপদে সম্বল। নগদ টাকা, এমনকী মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণও, সহজে সেই জায়গা নিতে পারে না। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে জমি বেচা মানে যে হেতু এক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া, সিঙ্গুরের প্রতিরোধ তাই নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, তার পিছনে জোরদার অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সেই গহ্বর এত গভীর ছিল কেন? বাকি দেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক গতিপথ নিয়ে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও প্রতীত জৈনের সঙ্গে আমাদের দু'জনের সাম্প্রতিক গবেষণায় এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর পাওয়া যায়। ১৯৮০-র দশক থেকে কৃষিখাতে রাজ্যের বৃদ্ধি জাতীয় গড়কে ছাড়িয়ে গেলেও, ১৯৭০-এর দশক থেকে শিল্পে তারা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে এবং ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৮০ ও '৯০-এর দশকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু যখন দ্রুত শিল্পোন্নত হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র তখন স্থবির। পরিষেবা ক্ষেত্র বাকি দেশের চেয়ে দ্রুত বাড়লেও শিল্পের ঘাটতি তারা পোষাতে পারেনি। উদারীকরণ-উত্তর জমানায় দেশের অর্থনীতি যে দিকে ঘুরছিল, রাজ্য তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কারখানার কাজের তুলনায় পরিষেবায় দক্ষ শ্রমের চাহিদা বেশি। যাদের একমাত্র সম্বল জমি এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কৃষিক্ষেত্রে নিবদ্ধ, তাদের বা তাদের পরবর্তী প্রজন্মে জীবিকার জন্যে কৃষির বিকল্প পথ তাই আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

যে কৃষকেরা জমি বেচতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও পন্থতিটা সোজা হতো না। অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভূমি বিভাজনের সমস্যা খুব বেশি। এর পিছনে শুধু জনসংখ্যার ঘনত্ব নয়, ভূমিসংস্কার নীতির সাফল্যও কাজ করেছে। পাট্টা জমির পুনর্বণ্টন এবং অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভাগচাষিদের নথিভুক্তির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যেমন কিছু সদর্থক প্রভাব দেখা গেছে (যেমন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়, পল গার্টলার ও আমাদের একজনের গবেষণা দেখিয়েছে যে, অপারেশন বর্গার ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতার হার বেড়েছিল), কিন্তু একইসঙ্গে শিল্প বা ব্যবসার জন্যে জমি অধিগ্রহণে আইনি বাধাও তৈরি করেছে। ছোট ছোট জমি একত্র করে কারখানা গড়ার অনেক সমস্যা। আর যদি কোনও জমিতে ভাগচাষি থাকে, তা হলে তো তার বাড়তি সমস্যা।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে জমি বিভাজনের সমস্যার এই তীব্রতাটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়। গ্রামীণ অঞ্চলে দুই একরের বেশি জমির মালিক প্রতিটি পরিবারের অনুপাতে দুই একরের কম জমির মালিক পরিবারের সংখ্যা ৯৮, যেখানে জাতীয় গড় মাত্র ৯। অন্য কোনও অঞ্চল এর কাছাকাছিও নয়— উত্তরে ৯.৮, পশ্চিমে ৪.২, দক্ষিণে ২৪.৯, এমনকী প্রতিবেশী বিহার ও ওড়িশায় যথাক্রমে ২৬ ও ২৪। যে জমি আসলে চাষ হয়, সেখানে এই অনুপাত দেখলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা ২৬, আর জাতীয় গড় ৪.৬— এ ক্ষেত্রেও রাজ্য সর্বোচ্চে।

এখন, জমির মালিকানা আর জমির খণ্ডের বিন্যাস এক নয়, এবং শিল্পায়নের জন্যে জমির প্রসঙ্গে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। তবে কৃষিসুমারির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের গড়ের তুলনায় রাজ্যে জমির মালিকানা এবং জমির খণ্ড, দুইয়েরই গড় অনেকটা কম, এবং একই মালিকানার জমি রাজ্যে অনেক বেশি খণ্ডে বিভাজিত।

মৌসুমী দাস, মিত মেহতা ও ত্রিদীপ রায়ের লেখা একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে এই জমি বিভাজনের সমস্যার ফলে শিল্পক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাপ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যে রাজ্যে গড় জমির খণ্ডের পরিমাণ কম, সেখানে বিশেষ ভাবে জমি-নির্ভর শিল্পের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান, দুটোই কম হারে বাড়ে। পাঁচ বছরের বৃদ্ধির হার ধরলে, যে যে রাজ্যে জমি অধিকতর বিভাজিত, তাতে জমিনির্ভর শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির হার জমির উপর ততটা নির্ভরশীল নয়, সেই সব শিল্পের হারের থেকে ১২ শতাংশ বিন্দু কম, আর কর্মসংস্থানের হার ১০ শতাংশ বিন্দু কম। এই নঞর্থক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে নতুন বেসরকারি উদ্যোগে, যেগুলো শিল্পায়নের মূল চালিকাশক্তি। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ এই প্রেক্ষিতে একটি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য।

কারখানার জন্য দরকার সংলগ্ন জমি, কিন্তু শত শত ক্ষুদ্র মালিকের সঙ্গে আলাদা আলাদা দর কষাকষি করতে গেলে 'হোল্ড-আউট' সমস্যা তৈরি হয়, অর্থাৎ, সবার সঙ্গে চুক্তি হতে অনেকটা সময় লাগে আর তা শিল্প বিনিয়োগের প্রক্রিয়াটাকে কঠিন করে তোলে। ইতিহাসের পরিহাস, যে সরকার ভূমিসংস্কার সফল রূপায়ণ করেছিল, তার সেই সাফল্যই পরবর্তী কালে উন্নয়নের পথকে কঠিন করে দিলো।

এই কাঠামোগত সমস্যার উত্তরাধিকারের সঙ্গে শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতির সংঘাত অনিবার্য ছিল। সিঙ্গুর হয়ে উঠল সেই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। আলোচনার পথ না খুঁজে প্রকল্প ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতাবস্থা একটা সহনীয় জায়গায় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র কৃষকেরা নেহাতই নিরুপায় অবস্থায় ছিল না। যে নিরাপত্তার জায়গা থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে খুব একটা আপত্তি করেননি, তা কিন্তু সফল ভূমিসংস্কার এবং বামফ্রন্ট সরকারের বৃহত্তর গ্রামীণ উন্নয়ন নীতির ফল, যা শিল্পায়নের সঙ্গে যে পরিবর্তনের ঢেউগুলো আসাটা অনিবার্য, তা মেনে নেওয়ার তাগিদটাকে কমিয়ে দিয়েছিল।

শিল্প অন্যত্র চলে যাওয়ার পর যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে মোকাবিলা করার রাজনৈতিক ভাবে সহজ পথ ছিল কল্যাণমূলক প্রকল্প। রাজ্য সরকারের নানা নগদ হস্তান্তর প্রকল্প নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে, কিন্তু সেগুলো বাদ দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে (যেমন, খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা) রাজ্যের রেকর্ড কিন্তু সত্যিই ভালো। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের পারিবারিক ভোগব্যয় সমীক্ষার পরিসংখ্যান নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের পরিবারগুলি সরকারি বস্তুগত হস্তান্তর পেয়েছে রাজ্যের গড় ভোগব্যয়ের অনুপাতে, তা জাতীয় গড়ের প্রায় দ্বিগুণ— এই দুই অর্থবর্ষেই বড় রাজ্যগুলির মধ্যে তারা প্রথম বা দ্বিতীয়। এর পেছনে 'দুয়ারে রেশন'-এর মতো প্রকল্পের ভূমিকা আছে, যার ফলে এই সব প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি সংখ্যায় লোকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই সাফল্য স্বীকৃতির দাবি রাখে। কিন্তু কাঠামোগত রূপান্তর ছাড়া শুধু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা স্থিতাবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, বদলায় না। সেই প্রেক্ষিতে দেখলে রাজ্য সরকারের নানা রকম নগদ হস্তান্তর নীতির কল্যাণমূলক দিক থাকতে পারে, কিন্তু তা এক বৃহত্তর সমস্যার উপসর্গও বটে। শুধু তা-ই নয়, সরকারি রাজস্বের এই ব্যবহার পরিকাঠামোর জন্যে বিনিয়োগের বা কর্মসংস্থানের সহায়ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থ নিশ্চিত ভাবে কমিয়ে দিচ্ছে, রাজ্যের ঋণভার বাড়াচ্ছে।

তা হলে মোদ্দা কথা কী দাঁড়াল? উন্নয়নের কাঠামোগত রূপান্তর হয় এক ক্ষেত্র থেকে আর এক ক্ষেত্রে শ্রম, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং পুঁজির পুনর্বিন্যাসে। জমি যদি না পাওয়া যায়, পুঁজি যদি আসতে না চায়, কৃষির উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার যদি শ্লথ হয়, তা হলে শ্রমকেই সচল হতে হয়। তমোঘ্ন হালদারের সঙ্গে আমাদের একজনের গবেষণা দেখাচ্ছে যে, মূলত নির্মাণ ও শিল্পক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকেরা যাচ্ছে। রাজ্যে শিল্পায়ন হলে তাদের অনেকে হয়তো যেত না। শিল্পায়নের কাঠামোগত সমস্যাগুলো কী ভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে, তা নিয়ে নতুন কোনও চিন্তাভাবনা না হলে এই স্থিতাবস্থা থেকে বেরোনো মুশকিল।

কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল দৃশ্যমান, তার থেকে যে রাজনৈতিক পুঁজি অর্জন করা যায় তার লাভ সরাসরি ভোটে ধরা পড়ে।

এখানে একটা বিষচক্রের ফাঁদ কাজ করেছে। শিল্প হচ্ছে না বলে বিকল্প কর্মসংস্থান কম, বিকল্প কম বলে জমি-নির্ভরতা প্রবল, আর সে কারণেই জমি অধিগ্রহণ কঠিন— তাই শিল্প হচ্ছে না। এক সময়ের জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। বাস্তবে হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উল্টোটাই— কৃষি একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির শক্তি এবং দুর্বলতা। যে ভূমিসংস্কার গ্রামীণ দারিদ্র্য কমিয়েছিল, সেটাই শিল্পায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর রাজত্বের দেড় দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও নতুন সরকার সেই বাধা অতিক্রম করার কোনও নতুন পথ দেখাতে পারেনি।

এই ফাঁদ থেকে বেরোতে না পারার পেছনে রাজনৈতিক প্রণোদনা বেশ শক্তিশালী। কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফলগুলো দৃশ্যমান, তাই তার জন্যে যে রাজনৈতিক পুঁজি অর্জন করা যায়, তার থেকে লাভ সরাসরি ভোটে ধরা পড়ে। তুলনায় শিল্প বিনিয়োগ আসতে সময় লাগে, তার সুফল ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটি মন্থর, আর তার শুরুতেই আছে বিঘ্ন— জমি নিয়ে সংঘাত, কৃষি ও জমির শিকড় ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া। যে কোনও সরকারের সামনে একই হিসেব— রূপান্তরের সুফল মেলে এক দশক পরে, কিন্তু তার মাশুল চোকাতে হয় এখনই। বিক্ষুব্ধ মুখগুলির বাস্তবতা প্রখর, আর যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষতি হচ্ছে, যার মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও আছে, যারা এখনও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা পায়নি, তাদের হতাশায় আচ্ছন্ন মুখগুলি পশ্চাৎপটের ছায়াচ্ছন্ন আলো-আঁধারে মিশে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা তাই শুধু কাঠামোগত নয়। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা আর অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা একে অপরকে আয়নার মতো প্রতিফলিত করছে এবং আরও শক্ত করছে।

অন্য কোথা। পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী নির্মাণ শ্রমিক ▶

মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক। **তনিকা চক্রবর্তী** আইআইএম, কলকাতায় অর্থনীতির শিক্ষক